অভিজিৎ সেন-এর ‘মেঘের নদী’ : গোষ্ঠীপতির জীবন বিপর্যয়ের ট্র্যাজেডি

টুম্পা দাস

Abstract

Abhijit Sen is an eminent literary writer whose literature is the main voice of struggles to protect the lives of the poor and their survival. In the real life experience Abhijit Sen blueprinted both the tyranny and opression of rich-wealthy people towards the poor; the total lifestyle of farmers, their culture and struggle for existence find expression in his novels. During the contemporary period the government and non-government institutions exposed their pseudo-philanthropic nature. In many of his novels Abhijit Sen has skillfully sketched the struggles of the ‘Rajbangshi’ community of Malda, Murshidabad etc. The main objective of his writings is to showcase the brutal situation in which the homeless people or refugees in India find themselves; their struggles of trying to form clusters of groups. The novels ‘Megher Nodi’, ‘Holud Ronger Surya’, ‘Shirin O Tar Parijon’ are examples of such expressions.

In the novel of ‘Megher Nodi’ Abhijit Sen shows human exploitation of people in the case of a tribal leader in a disaster. The Tribal leader lost his own ideals of social reform and the extreme economic crisis, droughts turned and ideal philanthropic man into a wizard who supposedly becomes a rape victim. A sudden incident in the life of Mahim, who takes the responsibility of provision for defense of the people in the form of group leader, destroys all his dreams of glorious life.

Key words : Partition, tribal life, class and caste exploitation.

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘রহু চন্ডালের হাড়’ যখন তার বৈচিত্র্যের সমাবেশ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয় তখন সচেতন পাঠকমন্ডলী বিস্ময়বোধে একপ্রকার মুগ্ধ হয়ে ওঠে। এই মুগ্ধতা তার বিকল্প বাস্তব ও বিকল্প গ্রন্থনার সম্ভাবনায়। চোখের সামনে যাযাবর সম্প্রদায়কে বারবার দেখেও তাদের নিয়ে এরূপ একটা কালজয়ী উপন্যাস লেখার কথা মাথায় আসেনি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো একজন বড় মাপের কথাসাহিত্যিকের। সেই যাযাবর জাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইকে দেড়শো বছরের কাহিনি বর্ণনায় ভাষা দিলেন অভিজিৎ সেন। একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হিসাবে বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে বাংলা সাহিত্যের দরবারে উপহার দিলেন ‘রহু

চন্ডালের হাড়’। সেদিনই পাঠকসমাজ অনুভব করেছিল বাংলা উপন্যাসের এমন একটি দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে যা পাঠককে কল্পনার মনোময় জগত থেকে টেনে এনে দাঁড় করাবে বাস্তবের রুক্ষভূমিতে, পরিচয় করাবে সেই সকল অবহেলিত নিম্নবর্গীয় মানুষের সঙ্গে যারা দলিত হয়েচে মূলতঃ মানুষের লোভ ও অহংকারের পদপৃষ্ঠে। শুধু তাই নয় উপন্যাসের আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেচে, একাধিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এবং সেই সকল চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন দিককে একটি সুতোয় বেঁধে ঔপন্যাসিক নিপুণ হাতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন উপন্যাসের পরিণতির পথে।

দেশবিভাগের সময় মাত্র আট নয় বছর বয়সে অভিজিৎ সেন বাড়ি (বরিশাল জেলা) ছেড়ে চলে আসেন ভারতে। শুরু হয় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এ লড়াই–এ তিনি নিজে সামিল হয়েছিলেন বলেই অনেক মানুষের জীবন গড়ার ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন তিনি। তাঁর ‘মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস’ উপন্যাসে অশোকের চাকরি পাওয়া, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা বাবা–মা–পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া – এসবের মধ্যে স্বয়ং অভিজিৎ সেনকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাছাড়া পারিবারিক সূত্রে উত্তরবঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানোর ফলস্বরূপ নিম্নবর্গীয় জনজীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এই সকল প্রান্তিক মানুষের জীবনকাহিনি ভাষা পেয়েছে তাঁর গল্প উপন্যাসে। বাস্তুভিটে ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে যাত্রা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার, রাজনৈতিক জীবন, উদ্বাস্তু হয়ে ক্যাম্পজীবন কাটানো ও স্থিতি হওয়ার লড়াই এবং ভূমি প্রতিষ্ঠার লড়াই এগুলোর সঙ্গে ঔপন্যাসিকের বাস্তব অভিজ্ঞতার সংযোগ উপন্যাসের বিষয়কে আরও মর্মস্পশী ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা দান করেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘শিরিণ ও তার পরিজন’, ‘নিম্নগতির নদী’, ‘আঁধার মহিষ’ কিংবা ‘মেঘের নদী’ প্রভৃতি। লেখকের অধিকাংশ চরিত্রই যাযাবর, রাজবংশী, কোল, সাঁওতাল, নমঃশূদ্র প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় মানুষ।

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের একটি প্রধান সুর হল বাস্তুহারা সম্প্রদায়ের নিজের গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে স্থায়ী বাসভূমি নির্মাণ। গোষ্ঠীকে টিকিয়ে রাখার লড়াই দেখা গিয়েছে ‘হলুদ রঙের সূর্য’, ‘মেঘের নদী’ প্রভৃতি উপন্যাসে। এই টিকে থাকার স্বপ্ন কখনো পূরণ হয়েছে আবার কখনো ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী মানুষও কীভাবে আকস্মিক কোনো ঘটনার শিকার হয়ে গোষ্ঠীকে স্থিত করার স্বপ্নকে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে পারে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে ‘মেঘের নদী’ উপন্যাসের মহিম।

প্রান্তীয় জনজীবনের বৈচিত্রময়তা, তাদের সামাজিক সংস্কার, লোককথা, তাদের

জীবনের উত্থান পতনের কাহিনি অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে ভিন্ন মাত্রা এনেছে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো 'মেঘের নদী' উপন্যাসে উঠে এসেছে কৃষিকেন্দ্রিকতা, কৃষকের জীবনের হাড়ভাঙা পরিশ্রম এবং তাদের বিপর্যয়ের কাহিনি। রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থপরতা, জনজীবনের প্রতি তাদের মেকি আনুগত্য, সরকারী ও প্রশাসনিক দপ্তরের অনীহা – এসব কিছুকে অভিজিৎ সেন যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই সকল বাস্তব অভিজ্ঞতা উপন্যাসের রসদ হয়ে উঠেছে। 'মেঘের নদী' উপন্যাসে এই সকল বাস্তবতার নানা মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র সংকট অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে না। একটি উপন্যাসের মধ্যেই সচেতন পাঠক অভিমুখের বৈচিত্র্য খুঁজে পাবে। 'মেঘের নদী' উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা ভূমি প্রতিষ্ঠার লড়াই যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি দেখিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষিকেন্দ্রিক মানুষের বাস্তব অবস্থা এবং তাদের শোষণের চিত্র। গোষ্ঠী জীবনের ঐক্যবদ্ধকরণ, স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে নিম্নবর্গীয় জনজাতির বিশেষত নারীজীবনের অবদমনের অসামান্য দলিল হয়ে উঠেছে 'মেঘের নদী'। আর এর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখার চেষ্টা করব শিক্ষিত, পরিশ্রমী, গোষ্ঠীপতি মহিমের জীবন বিপর্যয়ের ট্র্যাজেডি।

উপন্যাসের মহিমের সমস্ত কাজের পিছনে ছায়ার মতো দাঁড়িয়েছিলেন তার বাবা দীপেন বিশ্বাস। বলা যায় দীপেন ছিল মহিমের জীবনের ideal চরিত্র। কোনো অন্যায় কাজ করার আগে বাবার ছবিটাই মহিমকে বাধা দিয়েছে সর্বদা। কারণ মহিম জানে তার বাবা খুব সাধারণ মানুষ নন। ১৯৫৫ সালে তিনি তাদের গ্রামটির পত্তন করেছিলেন – ''মালদা–রাজশাহী–দিনাজপুরের সীমানা ধরে জলা আর দহভর্তি দুর্গম অঞ্চলকে দেবেন বিশ্বাস, সন্ন্যাসী কাপালি আর হেম হালদার বেছে নিয়েছিল নিজেদের আর একবার থিতু করার জন্য।''[১]

দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের জীবনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়, কেড়ে নেয় জমি, খাদ্য ও বাসভূমি এমনকি পরিচয়ও। আর এই বিপর্যয় নেমে আসে হতদরিদ্র নমঃশূদ্র তথা নিম্নবর্গীয় জনজাতির জীবনে। নলদি পরগণা, মষিয়াহাটি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় ৩০০–এরও বেশি গ্রামে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। দেশবিভাগ এই সম্প্রদায়কে করে দিয়েছিল ছিন্ন ভিন্ন কিন্তু দীপেন বিশ্বাস কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে একজন দলপতি হিসাবে আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়েছে কেবল গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল গড়ে তুলেছেন যাতে গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হতে পারে। কলেজ করারও স্বপ্ন দেখেছেন যা এখন বাস্তবায়নের পথে। উদ্বাস্তু

ক্যাম্পে পশুর মতো অধম জীবনযাপন করেও একটা 'শক্তিশালী' জাতি পাথুরে, জলহীন দেশে নিজের জাতিকে, গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছে। নমঃশূদ্র হলেও তাদের জাতের ছেলে ব্রজেন বিশ্বাস এশিয়ার মধ্যে প্রথম হয়েছিল (ম্যাট্রিকুলেশন ফার্স্ট ডিভিশন)। এখানে লক্ষনীয় অভিজিৎ সেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ করতে চেয়েছেন কেবলমাত্র শূদ্রজাতির তকমা লাগানো থাকলেই কোনো জাতি দাস হয়ে যায়না। কঠোর পরিশ্রম আর মেধা কখনও কাউকে দমিয়ে রাখতে পারে না। দীপেন বিশ্বাস আমৃত্যু চেষ্টা চালিয়েছেন, স্বপ্ন দেখেছেন জাতির গৌরবময় ভবিষ্যৎ গড়ার। কিন্তু 'মেঘের নদী' উপন্যাস দীপেন বিশ্বাসের গল্পে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কাহিনির দিক পরিবর্তিত হয়েছে। আর এই পরিবর্তন মহিমের জীবনের কঠোর সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। চাকরির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে মহিম। অবশেষে চাকরির আশা ত্যাগ করে অর্থ উপার্জনের ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। আর এই পথেই সে হয়েছে উচ্চবর্গের মানুষের অত্যাচার আর অবহেলার শিকার। এই সকল বিপর্যয়ের মধ্যেও নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করেছে মহিম কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

মহিমের জীবন বিপর্যয়ের ঘটনায় তার বাবার জীবনকাহিনি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অহেতুক মনে হতে পারে। কিন্তু দেবেন বিশ্বাসের চরিত্রের হাত ধরে গড়ে ওঠে মহিমের আদর্শ। নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনে যৌনতা, যৌন সম্পর্ক, অবৈধ সম্পর্ক প্রভৃতি অবাধে চলে কিন্তু দীপেন বিশ্বাস সচেতনভাবে এগুলো এড়িয়ে চলেছেন। মহিমকেও তিনি এই আদর্শেই দীক্ষিত করেছেন। কিন্তু আকস্মিক ঘটনা মহিমকে বিচলিত করে তুলেছে। ঔপন্যাসিক বলেছেন – ''মহিমের ভিতরে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আগের থেকেও বেড়ে গেল। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা স্থূল কদর্যতা আছে তাকে অতিক্রম করা তার পক্ষে সহজ নয়। উপরন্তু তার বাবা গোষ্ঠীপতি দেবেন বিশ্বাস আবাল্য তার যাবতীয় নিষেধের প্রাচীরের ধারে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে দু–হাতে শূণ্যে তুলে প্রায় ছুঁড়েই চৌকির শেষপ্রান্তে ফেলে দিল।''[২] এমনকি জিনত–এর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মহিম তার বাবা দেবেন বিশ্বাসের ব্যথিত বিষন্ন মুখখানা দেখতে পেল। বাবার এই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, আদর্শ মহিমকে ভরসা যুগিয়েছে চিরকাল কিন্তু ঔপন্যাসিক মহিমকে দেবতা করে তুলতে চাননি। মানবিক চাওয়া পাওয়াকে মহিম অস্বীকার করেনি। তার মধ্যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরই প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এই প্রবৃত্তি যখন ধর্ষণের পর্যায়ে গিয়ে উত্তীর্ণ হয় সমাজ তাকে গুরুতর দণ্ড দেয়। মহিমের পরিশ্রমী কর্মময় জীবনে মহিম ধর্ষণের মতো একটি আকস্মিক ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়ে, যা একদিকে তার বাবার স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার

করে তোলে অন্যদিকে মহিমকে করে তোলে বিপর্যস্ত ও মণিমালাহীন।

উপন্যাসে মহিমের হাজতবাসের ঘটনার মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক আশ্চর্য কৌশলে তার বাবার ও পরবর্তীতে তার কর্মকান্ডের পরিচয় দিয়েছেন। টুকরো টুকরো ঘটনাগুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজালে আমরা মহিমের কর্মময়, সাহসী, বলিষ্ঠ জীবনের পরিচয় পাব। মহিম কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক। কিন্তু চাকরি নয় নিজেকে সে নিয়োজিত করে গোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রকল্পে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যোতির্ময় রায়কে মহিম বলেছিল ''চাকরি করিনি একথা ঠিক নয় স্যার। পাশ করার পর বেশ কিছুদিন চাকরি খুঁজেছি। করবার মতো উপযুক্ত চাকরি পাইনি। আর আমি ঠিক গ্রাম উন্নয়নের কাজ করছিনা স্যার। গ্রামাঞ্চলের যে সব কাজে পয়সা আছে, সেই সব কাজ আপনাদের কাছে শেখা বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে শুরু করেছি। যদি সফল হই অনেক মানুষ উপকৃত হবে। আমারও রোজগার হবে। স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার মতো তো পারিবারিক অবস্থা আমার নয় স্যার।''[৩] আসলে মহিমের বিশ্বাস ছিল মানুষের অন্ন সংস্থানের কঠিন কাজটা সে করতে পারবে। দেবেন গোষ্ঠীকে বসত করার দায় নিয়েছিল। কিন্তু মহিমের স্বপ্ন তারও ঊর্ধ্বে অগ্রসর হয়েছিল। কোনও রাজনৈতিক সংগঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেনি।

মানুষের অন্নসংস্থানের কাজে নিয়োজিত হয়ে প্রথম দু'বছরের সফলতা মহিমকে খানিকটা অহংকারিও করে তুলেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে নেমে আসে বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে খরা, অনাবৃষ্টি, অন্যদিকে রয়েছে উন্নয়নমূলক কাজে পরিকল্পনার অভাব, সরকারী ব্যবস্থার বাঁধন। মহিম কখনোই সরকারী, বেসরকারী কোনো সংগঠনে সংঘবদ্ধ হতে নারাজ, কিন্তু সকলের সঙ্গেই একটা নিরাপদ দূরত্ব রেখে চলত। তাই স্যারের কথায় এন.জি.ও. করতে রাজী হয়নি। উপন্যাসে অভিজিৎ সেন এ প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন এন.জি.ও. (Non Government Organization) সংস্থানের রমরমা, সংস্থাগুলি প্রধানত উন্নয়নের কাজে অংশীদারী হওয়ার জন্য Fund জোগাড় করে নানাভাবে, কিন্তু বাস্তবে এটি একটি ব্যবসায়িক প্রকল্প হয়ে ওঠে, তাই নানাভাবে কর্মঠ পরিশ্রমী মানুষকে সংঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু হল সংস্থাগুলির।

একজন পরিশ্রমী কর্মঠ মানুষ যে একটা গোষ্ঠীকে উন্নত করতে তার যাবতীয় কর্মজীবনকে বিপুল কর্মযজ্ঞে সোঁপে দেয় তার সফলতা সর্বদা কাম্য। কিন্তু আমাদের চোখের আড়ালে ঘটে যাওয়া খানিক সময়ের অসতর্ক ঘটনা যখন তার সফলতাকে পিষে মারে, তখনই জন্ম নেয় ট্র্যাজেডি। মহিমের জীবনে নেমে এসেছে সেই ট্র্যাজেডি। ঔপন্যাসিক বলেছেন ''দেবতার মতিভ্রম হয় কিন্তু মানুষের হলে চলে না।'' দিনের পর

দিন প্রচন্ড খরা ও সূর্যতাপে মানুষের মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রচন্ড তাপে পঞ্চান্ন বিঘা তরকারি আবাদ জ্বলে পুড়ে যেতে দেখেছে মহিম। একজন কৃষকের এই দৃশ্য কতখানি যন্ত্রণার উদগীরণ ঘটাতে পারে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

তরকারির সঙ্গে সঙ্গে মাছ চাষেও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে মহিম। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছে মাছ চাষের জন্য। আর ব্যাঙ্কের নিয়ম ফাল্গুন মাসে মাছ মারতে হবে কিন্তু প্রবল তাপে জ্যৈষ্ঠ মাসে মাছ মরতে শুরু করে। মহিম মাছ তুলে বিক্রি করার অনুমতি পায় না। ফলে চরম একটা আর্থিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ায় মহিম। সেই সঙ্গে কর্মহীন মানুষদের দাবী মেটানো, তিন লাখ টাকার ব্যবসায় কেবল পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ফিরে আসা এইসব সমস্যার সম্মুখীন হয় মহিম। হারিয়ে ফেলে তার আদর্শবোধ, তার আত্মবিশ্বাস। সমস্যার সমাধানে ব্যাঙ্কের সাহায্য না পাওয়া, ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ অফিসারদের কাজের উদাসীনতা, যথার্থ পরিকল্পনার অভাব মহিমকে সম্পূর্ণ বিষাক্ত করে তোলে। আর সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত চাহিদা। যৌনক্ষুধা মহিমের মধ্যে ঘুমন্ত অপদেবতাকে জাগ্রত করে তোলে।

অভিজিৎ সেন মহিমকে অসামান্য কোনো পুরুষ করে তুলতে চাননি। পুরুষ চরিত্রের সহজাত প্রবৃত্তিকে সামনে রেখে একটা রক্ত মাংসের মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। একজন শিক্ষিত আদর্শবান কর্মপ্রিয় পুরুষের চোখেও যে নারীর সৌন্দর্য তুচ্ছার্থক নয় সেদিকটি অভিজিৎ সেন এড়িয়ে যাননি। রমণীর স্তন বিষয়ে বিশেষ মুগ্ধতা ছিল মহিমের। মহিমের এই কাঙালপনা সারা জীবন ধরে ছিল। এটি তার চরিত্রের একটি দুর্বলতা যাকে অভিজিৎ সেন উপেক্ষা করেননি। স্ত্রী মণিমালার সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিল মহিম, অন্তঃসত্ত্বা মণিমালার অনুপস্থিতি মহিমের যৌন ক্ষুধা বাড়িয়ে তুলেছিল, কিন্তু মহিমের শিক্ষা, তার বাবার আদর্শ চিরকাল মহিমকে এই আসক্তিতে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দিয়েছে। তাই গুইন্দুর সঙ্গে বেশ্যালয়ে গিয়ে তরুণী রমণীকে সে সহজে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এমনকি জিনত–এর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধা দিয়েছিল আয়নায় ভেসে ওঠা দীপেন বিশ্বাসের মুখ।

একজন বড়মাপের ব্যবসাদার যার ওপর মূলত একটা গোষ্ঠীর অন্নসংস্থান নির্ভর করে তাকে যে উন্নয়নের জন্য সুযোগ্য পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাবলী সম্পাদন করতে হত সে কথা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন ঔপন্যাসিক। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিরা কীভাবে কাগজে কলমে জনদরদী হয়ে উঠেছেন, উন্নয়ন করেছেন তার পরিচয় পায়, অথচ জনজীবনের সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই। মৎস চাষ উন্নয়ন দপ্তরের মিটিং–এ আমরা দেখি সভাপতি নেই, মহকুমা শাসক নেই। উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের এরূপ

অনীহা তাদের শোষণের শিকার হয়েছে মহিম, মহিমের মতো কর্মদ্যোগী গোষ্ঠী নেতা। এরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজের চাপে মহিম ক্ষতবিক্ষত। তার মানসিকতা তিক্ত হয়ে উঠেছে ক্রমাগত। সেই সঙ্গে প্রকৃতির নির্মম দলন, প্রখর রৌদ্রতেজ মহিমকে স্বাভাবিক থাকতে দেয়নি – ''বিগত দশ–পনেরো দিন যাবত তার মনের আকাশে ধীরে ধীরে যে ঝটিকার মেঘ জমছিল তা শুধু এ কারণেই নয় যে তার তিলতিল করে গড়ে তোলা কর্মকান্ডে একটা বড় বিপর্যয় এসেছে। কিন্তু এই বিপর্যয় তাকে তার সারাজীবনের এবং তার গোষ্ঠীর অনুক্রমিক যত হতাশা আর অপমান, সব একত্র করে একটা প্রবল আলোড়ন তুলেছে।''[৪] এই আলোড়নে আলোড়িত মহিমের পরিণতি ধর্ষণে অভিযুক্ত একজন আসামী হিসাবে।

শিলিগুড়ির বেশ্যাবাড়িতে তরুণী কিংবা জিনতের কামনাকে জয় করতে পারলেও মানসিক চাপে ক্ষতবিক্ষত মহিম মঙ্গোলিয়র মেয়েটাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তিন লাখ টাকার ব্যবসায় আর্থিক অনটনের দিনে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ফিরে এসেছে মহিম। কর্মীদের দাবী মেটাতে না পারায় বাজারে হাতাহাতির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সে বাড়ি না ফিরে খামার ঘরে ঢুকেছিল। ঔপন্যাসিক বলেছেন – 'গভীর ঘুম নয় কিন্তু তার ক্লান্তি সর্বগ্রাসী যেন সে নড়তেও পারবে না। এমন মনে হল তার। ...সে যেন কোথাও অপমানিত হচ্ছে সে যেন স্কুলে অন্য ছেলেদের হাতে মার খাচ্ছে, সে কিছু করতে গিয়ে ধরা পড়ে সম্পূর্ণ বে–ইজ্জত হচ্ছে। এবং সবশেষে গত তিন মাসের অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষা সব দূরন্ত ফ্যানটাসি হয়ে তার যাবতীয় কল্পনাকে অতিক্রম করে শরীরী হতে শুরু করল।''[৫]

একটা মানুষের ওপর যখন অনেকগুলো মানুষের সুখ দুঃখ, বেঁচে থাকায় দায়িত্ব অর্পিত হয় তখন তাকে অনেক শ্লেষ, বাঁধা অপমানের ঊর্ধ্বে গিয়ে নিজেকে সংযত রাখতে হয়। কিন্তু এই সংযমেরও হয়তো একটা সীমা আছে, মহিম তো আর স্বর্গের দেবতা নয়। কিন্তু মহিম সাধারণ শ্রমিকও নয়, একজন গোষ্ঠীপতি। দুশো–আড়াইশো লোকের কর্মসংস্থানের উন্নয়নের কাজ শুরু করার সময় সে সবটা বুঝতে পারেনি ফলে প্রচন্ড বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে মহিমকে। একজন সচেতন ঔপন্যাসিক রূপে অভিজিৎ সেন মহিমের এই মনঃপীড়নকে দেখিয়েছেন এইভাবে – ''সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে তার প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা সারা জীবন ধরে বাঙালি উচ্চবর্ণের কাছ থেকে পাওয়া তার সূক্ষ্ম ও স্থূল ঘৃণা, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রাপথে সংরক্ষণ সুবিধার জন্য পাওয়া শ্লেষ, অপমান, ক্রোধ, বিগত তিন মাসের যৌন অবদমন এবং সর্বোপরি এই ক্রমবর্ধমান খরা ও উজ্জীবিত দাবদাহ তার শরীর ও মনে এমন এক

বিচিত্র আলসেমি সৃষ্টি করল যা তার জাগ্রত চেতনাকে, তার আত্মশাসনকে এবং দেবেন বিশ্বাসকে পর্যুদস্ত করে ফেলল।''[৬]

সাজিয়ে তোলা মহিমের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে মঙ্গোলিয় মেয়ে উত্তরাকে ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। মঙ্গোলিয়র মেয়ে উত্তরার পরিবর্তে অন্য কোনো মেয়ে মহিম দ্বারা ধর্ষিত হলেও মহিমের জীবনে বিপর্যয়ের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটত না, কিন্তু অভিজিৎ সেন–এর সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন নিম্নবর্গের মানুষের ওপর অত্যাচার। মহিম উচ্চবর্ণের নয়, সেও কলেজ জীবন থেকে নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছে উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা। এখানে অভিজিৎ সেনের শিল্পকুশলতা লক্ষণীয়। একই সঙ্গে তিনি নিম্নবর্ণের মানুষের অত্যাচারকে ভিন্ন আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলেন উপন্যাসে।

যৌনতা একটা সমস্যার দিক রূপে উপন্যাসকে এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। যদিও 'মেঘের নদী' পর্ণগ্রাফী হয়ে ওঠেনি। বাস্তবকে সামনে রেখে মহিমের অন্তর্দ্বন্দ্বকে ও মানসিক অনুভূতিকে ভাষা দিতে ঔপন্যাসিক শিল্পের মোড়কে সমগ্র ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। যে বিবরণের আঙ্গিক সম্পূর্ণ অভিনব। লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে যন্ত্রণাকাতর তন্দ্রাচ্ছন্ন মহিম তার পকেটমারকে সনাক্ত করল। শুধু তাই নয়, রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়া মহিমের সামনে উত্তরার বিদ্ধস্ত পোশাক, উদ্ধত স্তনবৃন্ত মহিমের জাগ্রত চেতনাকে, আত্মশাসনকে, দেবেন বিশ্বাসকে পর্যুদস্ত করল। ঔপন্যাসিক বলেছেন – ''প্রকৃতিতে পুরুষের ভূমিকা একেবারে নির্মমভাবে নির্দিষ্ট। প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক প্রজনন–তৎপর প্রকৃতি এখন পর্যন্ত তার নিজস্ব নিয়মেই চলে। হায় অনুশাসন, হায় দেবেন বিশ্বাস!''[৭]

লক্ষণীয় বারবার অভিজিৎ সেন দেবেন বিশ্বাসকে এনেছেন, আসলে দেবেন বিশ্বাস মহিমের আদর্শ প্রতীক। তিনি বলতেন 'তুমি জানবে বাপ শুধু সন্তানকে শাসন করে, এমন নয়। সন্তান জন্মাবার আগে থেকে বাপকে শাসন করতে থাকে!' এই সচেতনতা দেবেন বিশ্বাসকে অর্থের প্রলোভন, স্ত্রীলোকের প্রলোভন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু সেই আদর্শ শেষ পর্যন্ত প্রবৃত্তির কাছে, শোষনের কাছে, প্রকৃতির নির্মমতার কাছে বিদ্ধস্ত হয়েছে – ''উত্তরা হাঁটুর উপরে উঠে আসতে মহিম ঘৃণা, হতাশা, অপমান, অপচয়ের এবং নিজের কাছ থেকে প্রাপ্ত ধিক্কার, প্রবঞ্চনা, এ সমস্ত কিছুকে একযোগে রেচন করার আগ্রহবোধ করল, যা এই মুহূর্তে লালসাই এবং যা থেকে উদ্ধার করার জন্য দেবেন বিশ্বাসও আর এসে দাঁড়াল না।''[৮]

অপদেবতা যখন শরীর থেকে অন্তর্হিত হয় তখন মহিম সম্বিত ফিরে পায় আর

ধর্ষণের অপরাধবোধ তাকে তার সাজানো স্বপ্ন থেকে এক লহমায় বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে পিষিয়ে মারে। অপরাধের শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত তার শান্তি আসে না। নিজে সারেনডার করে, জামিন নিতেও অস্বীকার করে। আসলে নিজেকে সে গুরুতর অপরাধী মনে করে। একটি সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ সেন বলেছেন –''ধর্ষণ ব্যাপারটাতে মানুষ যতখানি গুরুত্ব দেয়, আমার মনে হয় ততখানি গুরুত্ব পাওয়ার মতো অপরাধ এটা নয়। অনেকেই এটাকে নরহত্যা অপেক্ষাও অধিক অপরাধ বলে গণ্য করে। মহিমও করেছে। বিচারে যদি তার দীর্ঘ সময়ের জেল হয়, সে হয়তো এ বিষয়ে চিন্তা করার সময় ও সুযোগ পাবে। আমি সে পর্ব লিখিনি। মহিম উত্তরাকে ঠিক ধর্ষণ করেনি, আবার করেওছে। এ কথার অর্থ উত্তরা যদি আগ্রহী না হত মহিম তাকে ধর্ষণই করত। ধর্ষণ বিষয়ে যে সামাজিক সংস্কার অন্য বেশিরভাগ মানুষের মতো মহিমও তাতে আচ্ছন্ন।''[৯] মহিমের এই আচ্ছন্নতার মূলে রয়েছে তার চারিত্রিক দুর্বলতা ও লোকভয়। এখানেই ঔপন্যাসিক পাঠকের মনে চিন্তার অবকাশ তৈরী করেছেন – মহিম কি একমাত্র দোষী? এ ঘটনায় উত্তরার কী কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছিল না! এই সংশয়ের ওপর ভর করে হয়তো বলা যায় মহিমের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনায় তার সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ ছিল না। তাই গুইন্দু বলেছে 'রেপ মানে বলাৎকার। জোর করে কোনো মেয়ে লোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইয়ে করা'। কিন্তু ধর্ষণ প্রসঙ্গে অভিজিৎ সেন সামাজিক অবক্ষয়কেও এড়িয়ে যাননি। উপন্যাসে তাই বারবার এসেছে শকুনের প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –''আপনার মতে আমিও মনে করি নানা কারণ এ আধুনিক পৃথিবীতে এই বিশেষক্ষেত্রে চিরকালীন বেশ কিছু বিষয়ে যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, শোষণ এবং নিপীড়ন, দয়ামায়া প্রেম ইত্যাদি মানবিক গুণ, অশেষ প্রাপ্তি ও নির্বিচার ভোগের আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতিকে ধ্বংস করা এবং নির্লজ্জ মিথ্যাচার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় স্তরে ব্যপক অবক্ষয় হয়েছে। শকুনের অনুষঙ্গে এসব কথা আমি ভেবেছি।''[১০]

ঔপন্যাসিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দলপতির বিপর্যয়কে ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে অঙ্গীভূত করে দিয়েছেন। যে ঘটনা মহিমের জীবনে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে এসে তার বিশ্বাসবোধ তথা আদর্শচূর্ণ করে দিল, যার দায় সম্পূর্ণরূপে মহিমের ছিল না। একজন দলপতির দীর্ঘ পরিশ্রম কীভাবে মুহূর্তের ঠুনকো আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় তারই নির্দশন 'মেঘের নদী'। শুধুমাত্র হাজতবাসের ঘটনাতেই যদি মহিমের শাস্তি সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে হয়তো উপন্যাসটি মহিমের জীবন বিপর্যয়ের ট্র্যাজেডি হত না। এখন প্রশ্ন ট্র্যাজেডি কেন? ট্র্যাজেডি আসলে কোনও মানুষের এমন কোনো বেদনা বা

ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনি যা তার প্রাপ্য ছিল না। নির্দোষ একটি মানুষের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়কে আমরা ট্র্যাজেডি বলি।

একজন দলপতিরূপে যে মানুষটি দলকে পরিচালনা করার অঙ্গীকার করেছিল, কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে যে মানুষটি মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে চেয়েছিল, মাছের কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল একটি গোষ্ঠীর উন্নতি বিধানের জন্য, সে আজ জেলখানায় ধর্ষণের অভিযুক্ত আসামী। যার জীবন সফলতায়, ভালোবাসায়, উন্নতিতে, যশে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারত এক মুহূর্তে সে শূন্য হয়ে গেল। স্ত্রী মণিমালাও তাকে পরিত্যাগ করল। এই শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় মহিমের জীবনকে বিয়োগান্তক করেছে। একথা ঠিক যে, হয়তো মহিম খালাস পেয়ে যাবে, যদিও ঔপন্যাসিক তা জানাননি কিন্তু তবুও মণিমালাকে নিয়ে আবার নতুন করে সংসার বাধার সুযোগ মহিম আর পেল না। দলপতিরূপেও সে ব্যর্থ, স্বামীরূপেও সে ব্যর্থ, ব্যর্থ প্রেমিক রূপেও।

মহিমের ভাগ্যবিপর্যয়ের ট্র্যাজেডিকে আমরা এইভাবে দেখতে পারি –

- ট্র্যাজেডিকে প্রকৃতির নির্মমতা দেখা যায়, এখানেও লক্ষ্য করা যায় প্রকৃতি বিমুখ হয়েছে মহিমের সফলতায়। দশ–পনেরো দিন ধরে টানা খরা, অনাবৃষ্টি প্রখর সূর্যকিরণ মানুষের শুভবোধকে নষ্ট করে দিচ্ছে, মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে, মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটছে। চারিদিকে শস্য, তরকারি সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। লক্ষাধিক টাকার লোকসান মহিমকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল।
- মাছ চাষেরও মহিম তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এখানেও নিয়তির নির্মম পরিহাসে মহিম বিধ্বস্ত – ব্যাঙ্কের ঋণের চাপ, নদী, পুকুরের জল শুকিয়ে যাওয়া, মাছের মৃত্যু, প্রচুর টাকার লোকসান। ঔপন্যাসিক যথার্থ বলেছে – ''শক্তিশালী মানুষের মেরুদন্ড ভেঙে ফেলার জন্য আর কী কী আয়োজন দরকার?''[১১]
- লক্ষাধিক টাকার লোকসান, কর্মীদের পাওনা মজুরি দিতে ব্যর্থ হওয়া মহিমকে কর্মীদের সম্মুখে তীব্র চাপের মুখে পড়তে হয়।
- শহরে গিয়ে মহাজনদের কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায় না হওয়া, ব্যবসায় লক্ষাধিক টাকা নিয়োগ অথচ আদায় না হওয়ায় পাওনাদারদের দাবি মেটাতে অক্ষম হয় মহিম।

- তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়ে মানসিক শান্তিও পায় না মহিম। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী মণিমালা তিনমাস বাপের বাড়ি থাকায় তিনমাসের যৌন অবদমন সমস্ত আত্মবিশ্বাসের বেড়াজালকে ভেঙে দিয়েছিল।
- সর্বোপরি, উত্তরা মহিমের সারাদিনের সম্বল পাঁচ হাজার টাকায় হস্তক্ষেপ করেছিল। ইতিপূর্বেও মহিমের টাকা সে চুরি করেছে। চুরি করতে গিয়ে উত্তরার পোশাক আলগা হয়ে যায়। একদিকে ক্ষোভ অন্যদিক স্তনের ব্যাপারে মহিমের দুর্বলতা এই বিপর্যয়ের অনিবার্য কারণ হয়ে ওঠে।

এভাবেই মহিমের ভাগ্যদেবতা মহিমের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটায়। তার জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়ের অন্ধকার যা মহিমের প্রাপ্য ছিল না। এই কারণেই আমরা মহিমকে দোষী বলতে পারি না। দুর্বল চিত্তের অধিকারী মহিম যখনই উপলব্ধি করে সে ধর্ষণ করেছে তখনই তার অন্তরাত্মা ব্যথিত হয়। এই বেদনাতে সে হার মানতে চায় না, আবার উঠে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখে কিন্তু নিয়তি সেদিকেও মুখ ফেরান। সদ্য বাবা হওয়া মহিম সন্তানকে কাছে পায় না, কাছে পায় না স্ত্রী মণিমালাকেও। মণিমালা মহিমের ধর্ষণকে মেনে নিতে পারে না, মহিমের সঙ্গে সে আর থাকতে রাজী হয় না। যদিও মণিমালার সিদ্ধান্তের উপর ঔপন্যাসিকের হস্তক্ষেপ করার উপায় ছিল না কিন্তু অভিজিৎ সেন ধর্ষণকে পাশবিক অত্যাচার বলে মেনে নিতে পারেননি। তাই বলেছেন – ''তবুও আশার কথা এই আমার একজন পাঠিকা যিনি নিজেও লেখন এবং সত্যিসত্যিই বিদুষি আমাকে বলেছেন যে, মণিমালার সিদ্ধান্তে তিনি খুশি হননি। মন ভারাক্রান্ত হয়েছে তাঁর।''[১২] এখানেই মহিমের জীবন বিপর্যয় ট্র্যাজেডির স্তরে উত্তীর্ণ।

'মেঘের নদী' উপন্যাস অভিজিৎ সেন উচ্চবর্গের মানুষের দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষের শোষণকে যেমন দেখিয়েছেন তেমনি উপন্যাসে এসেছে ভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, নিজস্ব পরিচয় গঠন। বাস্তুহারা মানুষের দলকে সংঘবদ্ধ করার ইতিহাস আছে 'মেঘের নদী' তো সেইসঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলি মুনাফা লাভ, জনজীবনের প্রতি সংগঠনের অনীহা, রাজবংশীদের আন্দোলন, কামতাপুরী সংগঠন এসবও বাস্তববাদী লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। আর সমসাময়িক ঘটনার বেড়াজালে আবদ্ধ একজন গোষ্ঠীপতির জীবন বিপর্যয়কে দেখিয়েছেন অভিজিৎ সেন এ উপন্যাসে। 'স্বধর্ম' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন – ''মহিম হালদার এমন একজন গোষ্ঠীপতি। একটি আকস্মিক ধর্ষণের ঘটনায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং গোষ্ঠীর জীবন বিপর্যয় ডেকে আনে সে।''[১৩] এই বিপর্যয় মহিমের শুধু স্বপ্নভঙ্গ হয়নি। তার জীবন মণিমালাহীন হয়ে পড়েছে। এটিই তার জীবনের ট্র্যাজেডি। একজন দলপতির

জীবনের ভাগ্য বিপর্যয় কীভাবে গোষ্ঠীজীবনের আশা–আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দেয়, তার একটি আলেখ্য হয়ে উঠেছে ‘মেঘের নদী’।

তথ্যসূত্র :

১) অভিজিৎ সেন, মেঘের নদী (কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারী, ২০১৬), পৃঃ–১৬
২) অভিজিৎ সেন, মেঘের নদী, পৃঃ–৩৯
৩) অভিজিৎ সেন, মেঘের নদী, পৃঃ–৬৭
৪) অভিজিৎ সেন, মেঘের নদী, পৃঃ–৭৪
৫) অভিজিৎ সেন, মেঘের নদী, পৃঃ–৭১
৬) অভিজিৎ সেন, মেঘের নদী, পৃঃ–৭৪
৭) অভিজিৎ সেন, মেঘের নদী, পৃঃ–৭৫
৮) অভিজিৎ সেন, মেঘের নদী, পৃঃ–৭৭
৯) বিকাশ শীল (সম্পাঃ), জনপদপ্রয়াস (বইমেলা : জানুযারী, ২০০৬, ৮ম বর্ষ), পৃঃ–২৭
১০) বিকাশ শীল (সম্পাঃ), জনপদপ্রয়াস, পৃঃ–২৮
১১) অভিজিৎ সেন, মেঘের নদী, পৃঃ–৬৮
১২) বিকাশ শীল (সম্পাঃ), জনপদপ্রয়াস, পৃঃ–২৭
১৩) অভিজিৎ সেন, স্বধর্ম (শারদীয়, ১৪১২), পৃঃ–২০৪